সামিকে সম্মান যেন মিথ ভাঙা নতুন সংস্কৃতি

রূপক বসু

বাঙালির বড় ম্যাচ! কে বলল, এ লড়াই শুধু ৯০ মিনিটের? দলবদল থেকে কর্তাদের বাগযুদ্ধ। ইলিশ-চিংড়ি থেকে বাঙাল-ঘটি। ক্রিকেট থেকে হকি হয়ে সাম্প্রতিক কালে পুরস্কার মঞ্চেও যে চলে এসেছে বাংলা ও বাঙালির চিরন্তন ডুয়েল। এখানেও দুটো তারিখ বেশ পিঠোপিঠি। ২৯ জুলাই সবুজ মেরুনের ‘মোহনবাগান রত্ন’ তো ১ অগস্ট লাল হলুদের ‘ভারত গৌরব’। ঘটনাচক্রে পুরস্কারের ডার্বির প্রথমার্ধ ১-১। কারণ ‘রত্ন’ আর ‘গৌরব’-এর নাম একই, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

কিন্তু ডার্বি আর কবে টুইস্ট ছাড়া হয়েছে? দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই যেন নতুন চাল। ইস্টবেঙ্গল ‘প্রাইড অফ বেঙ্গল’ হিসেবে ঘোষণা করে দিল মহম্মদ সামির নাম। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে যেখানে লাল হলুদকে হারানোর জন্য বাইশ গজে ঝলসে উঠত তাঁর পেস।

এমন একজনকে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বেছে নেওয়া কেন? ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের জবাব, ‘আমরা সামিকে বাংলার গর্ব হিসেবে দেখেছি বলেই সম্মানিত করতে চেয়েছি। কোন ক্লাবে খেলেছে, সেটা বড় কথা নয়।’ এক সময়ে মোহনবাগানের কোচ আব্দুল মুনায়েম এখন ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে। তাঁরও বক্তব্য, ‘খেলার মাঠ যে কতটা উদার, এই পুরস্কারই তার প্রমাণ।’

ময়দানে অবশ্য দুই প্রধানের রেষারেষির গল্পও চলছে। সামির ঘটনায় দলবদলের ছায়া দেখছেন অনেকে। এই শতকের শুরুতে সুব্রত ভট্টাচার্যকে কোচ করে ইস্টবেঙ্গল যে চমক দিয়েছিল, সে স্মৃতিও উস্কে দিচ্ছে অনেককে।

মজিদ বিসকার ও সুভাষ ভৌমিক। দুই পুরস্কারপ্রাপক সৌরভ (উপরে) ও সামি (নীচে)

তোলার পিছনে বড় অবদান ছিল বাংলার পেসার সামির। সে দিক থেকে দেখলে এ বছরই তাঁকে বাংলার গর্ব হিসেবে পুরস্কৃত করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু সামিকে পুরস্কার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যেন ময়দানে এক নতুন সংস্কৃতির আমদানি করেছে মশাল বাহিনী। বার্তা এটাই যে, সেই ক্লাবের জার্সি গায়ে না উঠলেও তাঁর কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে কোনও দ্বিধা নেই।

ঘটনা হল, সামি কোনওদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়েই খেলেনইনি। এমন অনেকেই অতীতে সম্মান পেয়েছেন, যাঁরা ইস্টবেঙ্গলে খেলেননি। কিন্তু এমন একজন প্লেয়ার, যিনি মোহনবাগানে খেলেছেন, অথচ ইস্টবেঙ্গলে খেলেননি, এমন কাউকে সম্মান দেওয়ার ঘটনা পুরস্কারের ডার্বিতে বিরল। সৌরভও খেলেছেন দুই প্রধানে। সামি কিন্তু ক্লাব ক্রিকেটের ডার্বিতে নেমেছেন,

এমনিতে দলবদলে দুই প্রধানের অনেক পাওয়া-না পাওয়া আছে। মজিদ বিসকার যেমন মোহনবাগানে খেলেননি, তেমনই কখনও ব্যারেটোকে পায়নি ইস্টবেঙ্গল। সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের না পাওয়ার আক্ষেপ রয়েছে লাল হলুদ কর্তাদের। মোহনবাগানও তেমন ফেরাতে পারেনি তুষার রক্ষিতকে।

সব সম্ভাবনা বোধহয় শেষ হয়ে যায়নি। না খেললেও প্রতিপক্ষের মঞ্চে সম্মানিত হতে দ্বিধা নেই। গায়ে মোহনবাগানি তকমা সাঁটা সামির হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল ইস্টবেঙ্গল।

থরে থরে সাজানো ট্রফির মিছিল। ইস্টবেঙ্গল মিউজিয়ামে ঢুকলেই চোখে পড়বে এমন দৃশ্য। ছবি তুলেছেন অভিজিৎ আঢ্য ও অর্ণব চক্রবর্তী

সংখ্যায় লাল হলুদ

৩
একমাত্র ভারতীয় টিম, যারা প্রথমবার টানা তিনবার আইএফএ শিল্ড জেতে (১৯৪৯-৫১)

৩
একমাত্র ভারতীয় ক্লাব, যারা বিদেশে তিনটে টুর্নামেন্ট জিতেছে (ওয়াই ওয়াই কাপ-১৯৯৩, আশিয়ান কাপ-২০০৩, সান মিগুয়েল কাপ-২০০৪)

৩
একমাত্র ভারতীয় ক্লাব, যার তিনজন প্রতিনিধি অলিম্পিক্সে গোল করেছেন। আমেদ খান-১৯৫২, জে কিট্টু-১৯৫৬, তুলসীদাস বলরাম-১৯৬০

১
প্রথমবার কোনও বিদেশি ক্লাবকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয়ী ক্লাব। ইরানের পাস ক্লাবকে হারিয়ে ১৯৭০ সালে

১
কলকাতা লিগে প্রথম ডার্বিতে মোহনবাগানকে ১-০ হারিয়ে জয়। গোলদাতা নেপাল চক্রবর্তী

১৪৮
সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল ভাইচুং ভুটিয়ার

৩৯
ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগ জিতেছে ৩৯বার

৫-০
১৯৭৫ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ক্লাবের এই জয়, এখনও কোনও কলকাতা ডার্বিতে সবচেয়ে বড় জয়

তথ্য: গৌতম রায়

ইস্টবেঙ্গল ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল টোডির স্বপ্ন

‘ক্রিকেটের হাত ধরে হকিতেও ভারতসেরা হবেই লাল হলুদ’

এই সময়: ছোট্ট বেলায় বাবার হাত ধরে শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, মোহনবাগান মাঠেও যেত ছেলেটা। খেলা দেখতে। কিন্তু, মনের কোনে কোথাও লাল হলুদ রংটাই গেঁথে বসে গিয়েছিল। রাজস্থানের মানুষ হলেও পৈতৃক বাড়ি ছিল বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে। পূর্বপুরুষ পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই থেকেই কি ইস্টবেঙ্গলের প্রতি বাড়তি টান? ইস্টবেঙ্গলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা শ্রাচী গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি হেসে বললেন, ‘সে তো বটেই। আমরা তো এখানে থাকতে থাকতে বাঙালি হয়েই গিয়েছি। আর আমাদের বাড়ি যখন বাংলাদেশে ছিল, তখন ইস্টবেঙ্গলের প্রতি বাড়তি আবেগ তো থাকবেই।’

রাহুলকে আরও বেশি ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী করে তুলেছিলেন যিনি, তাঁর নাম কৃশানু দে। সবুজ মাঠে লাল হলুদ জার্সিতে কৃশানুর শিল্প সবার মতো মুগ্ধ করেছিল কিশোর রাহুলকেও। বলছিলেন, ‘আমেদ খান, রামবাহাদুর, বলরামদের গল্প শুনেছি বাবা-কাকাদের কাছে। আর কৃশানুকে খেলতে দেখেছি। চিমারও দারুণ ভক্ত ছিলাম। চিমার সঙ্গে কৃশানুর জুটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।’

সেই ক্লাবেই এখন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। অবাক লাগে না? রাহুল শুনেই বললেন, ‘অবশ্যই অবাক লাগে। মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। অনেকেই তো রয়েছেন। কিন্তু আমি যে সুযোগ পেয়েছি, ক্লাবের পাশে থাকার, এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।’

ইস্টবেঙ্গল মানেই যেন ফুটবল। সেটা সত্যিও। কিন্তু রাহুল চান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভারত সেরা হোক ক্রিকেট এবং হকিতেও। তাঁর কথায়, ‘বিশ্বকাপজয়ী সন্দীপ পাটিল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসেছেন অনেকবার। ক্রিকেট নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় আমাদের। টেনিসে লিয়েন্ডার আমাদের পাশে। এ ছাড়াও অ্যাথলেটিক্সেও বাংলা তথা দেশের জন্য কাজ করতে চাই। অ্যাকাডেমি তৈরি করব। কোচ তৈরি করার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নিচ্ছে শ্রাচী। কারণ আমরা দেখেছি, কোচ ভালো না হলে ভালো খেলোয়াড় তৈরি হয় না।’ রাহুল জুড়ে দিলেন, ‘ক্রিকেট এবং হকিতেও ভারত সেরা হবে ইস্টবেঙ্গল। সেই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছি আমরা, শ্রাচী স্পোর্টস।’

ময়দানে তো প্রবাদই আছে, ‘ইস্টবেঙ্গল যা বলে, তা করে দেখায়।’

কপিলের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

মঞ্চ থেকে নামতেই পাকড়াও

বিকাশ পাঁজি

হাওড়া মানে মোহনবাগানের বড় ঘাঁটি। আর সেই হাওড়ার বলুহাটির ছেলে আমি। তা সত্ত্বেও আমি কী করে ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলে হয়ে উঠলাম, সেটা একটা বিরাট রোমাঞ্চকর গল্প।

১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আমি মোহনবাগানে খেলেছি। হাওড়ার ছেলে বলে সবুজ মেরুনে বোধহয় কিছুটা বাড়তি গুরুত্বও পেতাম। এই জার্সিতে আমার ভারতীয় টিমেও খেলা হয়ে গিয়েছিল। জীবনের মোড় ১৯৮৫ সালে। হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর সঙ্গে চিফ গেষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম সেখান থেকেই আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন মোহনবাগান রিক্রুটাররা। নতুন মরসুমে সই করানোর জন্য। আমার প্রিয় বন্ধু তথা জুটি কৃশানু (দে) কয়েক সপ্তাহ ধরেই আমাকে বোঝাচ্ছিল, মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি খুব একটা রাজি ছিলাম না। ইস্টবেঙ্গলের তরফে আমাকে বেশ ভালো টাকার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও আমি তা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি তখন মোহনবাগানে বেশ ভালোই ছিলাম।

ওই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ঠিক পরে মঞ্চ থেকে নামব, তখনই একজন আমার হাতটা রীতিমতো চেপে ধরে নিয়ে একটা গাড়িতে তোলে। যিনি আমার হাত ধরে সে দিন গাড়িতে তুলেছিলেন, তাঁর নাম দেবব্রত সরকার অর্থাৎ নীতুদা। সেই যে তিনি আমার হাত ধরেছিলেন, এত বছর পরে সুখে-দুঃখে আজও একইভাবে তিনি আমার হাত ছাড়েননি। আমি কৃতজ্ঞ নীতুদার কাছে। তিনি আমাকে ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে এসেছিলেন বলে।

প্রথমে যখন ইস্টবেঙ্গলে আসি, একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। কারণ যাঁরা আমাকে এভাবে হাইজ্যাক করে নিয়ে আসতে পারেন, তাঁরা তো আমি খারাপ খেললেও মারধোর করতে পারেন! কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ভয়টা উবে যায়। এই ক্লাবের পরিবেশ আর আতিথয়েতা এতটাই ভালো যে বছরের পর বছর এই ক্লাবে আমি খোলামনে খেলেছি। ক্যাপ্টেনশিপ করেছি। পরে সহকারী কোচও হয়েছি। এখনও ক্লাবে আসি। কারণ এটাই তো আমার সেকেন্ড হোম।

(সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুলিখন)

রঞ্জিত-প্রশান্ত স্বপ্ন দেখছেন আইএসএলের

পার্থ দত্ত

লাল হলুদ আবেগ কোথায় যেন মিলিয়ে দিচ্ছে খড়দহ আর কালীঘাটকে। আজ বৃহস্পতিবার খড়দহের বাড়ি থেকেই কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ইস্টবেঙ্গলের জীবনকৃতী সম্মান নিতে আসবেন রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়। আজ থেকে ৪৯ বছর আগে এই খড়দহ থেকে এসেই তো ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন বাংলার অন্যতম সফল স্ট্রাইকার রঞ্জিত। কালীঘাটের বাড়ি থেকেই ১৯৭৬ সালে গিয়ে প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় টিমের সর্বকালের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ প্রশান্ত সেই কালীঘাটের বাড়ি থেকে এসেই ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চে উঠবেন জীবনকৃতী সম্মান নিতে। এমন সম্মান নেওয়ার আগে রঞ্জিত-

প্রশান্ত আবেগাপ্লুত। কথায় কথায় স্মৃতির সরণি বেয়ে ফিরে যাচ্ছেন সাতের-আটের দশকে। লাল হলুদ জার্সিতে নিজেদের সেরার সেরা ম্যাচ কোনটা? দু’জনের জবাবে অদ্ভুত মিল। রঞ্জিত বলছিলেন, ‘১৯৭৫ সালে মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারানোর ম্যাচে আমি একটা গোল করেছিলাম। দুটো করিয়েছিলাম। অনেকেই বলেন, এটাই আমার সেরা ম্যাচ। কিন্তু তা নয়।’ তাহলে কোনটা? ১৯৭৫ সালে দিল্লিতে ডিএসএম কাপের সেমিফাইনালে ব্যাঙ্কক পোর্ট অথরিটির কাছে আমরা পিছিয়ে ০-৩ গোলে। সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে জিতে আমরা ফাইনালে যাই। একটা গোল আমার। বাকি তিনটে সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, কাজল মুখোপাধ্যায়ের। এমন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ আমি আর খেলিনি।’

লাল হলুদ জার্সিতে সেরা ম্যাচের কথা বলতে গিয়ে প্রশান্তের মুখেও তো সেই ডিসিএম। তাঁর কথায়, ‘১৯৮৩ সালের ডিসিএম ফাইনালে মহামেডানের বিরুদ্ধে মাঝমাঠ থেকে বল ধরে একের পর এক পাঁচ জন ফুটবলারকে (যার মধ্যে গোলকিপার অতনু ভট্টাচার্যও ছিল) কাটিয়ে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। ম্যাচটাও আমরাই জিতেছিলাম।’ প্রশান্তর আক্ষেপ, ‘সে সময় ম্যাচের রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা ছিল না। যদি থাকত, তাহলে এটা হয়তো অনেক আন্তর্জাতিক গোলের সঙ্গে তুলনীয় হত।’

রঞ্জিত ও প্রশান্তর আর একটা বড় মিল দু’জনেই ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি মোহনবাগান, মহামেডানে খেলেও অনেক সাফল্য পেয়েছেন। তবে তাঁদের লাল হলুদ প্রেম অনেকটা বেশি। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন রঞ্জিত। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন কর্তাদের কাজকর্মে বিরক্ত হয়ে ক্যাপ্টেনশিপ ছেড়ে চলে যান। তারপরে আর ফেরেননি। রঞ্জিতের কথায়, ‘খুব বেশি বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলিনি। কিন্তু সারা দেশের ফুটবলপ্রেমীরা আমাকে ইস্টবেঙ্গলের রঞ্জিত বলেই জানে। এটা আমাকেও তৃপ্তি দেয়।’

কৃষ্ণেন্দু ও অলোকের সঙ্গে জীবনকৃতী প্রশান্ত। উপরে, অন্য পুরস্কারপ্রাপক রঞ্জিত

প্রশান্ত ১৯৭৬ সাল থেকে ৭৯, তারপরে ৮২-৮৩। শেষে ১৯৯১-৯২ সালে ইস্টবেঙ্গল থেকে খেলেই অবসর নিয়েছিলেন। প্রশান্ত বলছিলেন, ‘ইস্টবেঙ্গলে প্রথমবারে খেলেই এফসিআইয়ে চাকরি পাই। এই ক্লাব থেকে ভারতীয় টিমে খেলি। এখান থেকেই আবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চাকরি পেয়েছি। বলতে পারেন, এই ক্লাবের হয়েই জীবনে আমার সব কিছু প্রাপ্তি।’

ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ছাড়ার চার দশক পরেও কেন এই আপনাদের এই ক্লাবের প্রতি টান রয়ে গিয়েছে? রঞ্জিত বললেন, ‘দেবব্রত সরকার অর্থাৎ নীতু যেভাবে সারা বছর ধরে যোগাযোগ রাখে। তার জন্যই বারবার ক্লাবে ছুটে আসি।’ প্রশান্তর বক্তব্যেও নীতু। ‘প্রত্যেকটা প্রাক্তনের সঙ্গে ও নিজে ফোন করে যোগাযোগ রাখে। প্রত্যেকেরই বিপদে দরকারে এখনও ঝাঁপিয়ে পড়ে।’ ক্লাবের নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁদের আর্জি থাকবে, ‘এবার আইএসএল ট্রফিটা তোমরা ক্লাবে এনে দাও প্লিজ। এবার আ ই এ স এ ল ট্রফিটা চাই।’

ইস্টবেঙ্গলের জন্মে থেকেছে দেশবন্ধুর ছোঁয়া

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বিশ শতকের গোড়া থেকে দ্রুত নিজেকে বদলে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠল বাংলা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ দ্রুত পরিণত হলো অগ্নিশিখায়। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তনে বদলাতে লাগল রাজনীতির ভাষা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা যেন আরও সুললিত এবং প্রয়োজনে জ্বালাময়ী হয়ে উঠল। মাঠে-ময়দানে তখন ভাষণ দিচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ফজলুল হকেরা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে তালিম নিতে গড়ে উঠেছে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর। ঠিক এই পটভূমিকায় কলকাতা ময়দানে মশাল জ্বালাল লাল-হলুদ ইস্টবেঙ্গল।

নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠার মঞ্চ তৈরি ছিল। সময়ের দাবি মেনে সেই ক্লাব ভূমিষ্ঠও হলো। একদিকে অপমান, লাঞ্ছনা অন্য দিকে, ব্রিটিশ বিরোধিতা। ইস্টবেঙ্গল যেন ভ্রূণ অবস্থাতেই লড়াই-জবাবের বার্তা পেয়ে গিয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই সে সাবালক। তার উপর ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, বাংলার ডব্লিউজি গ্রেস সারদারঞ্জন রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বরেণ্যদের স্নেহ, ভালোবাসায় ময়দানের শক্ত জমির উপর পা রেখেছিল এই ক্লাব। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দাদা সারদারঞ্জন একদিকে শিক্ষাবিদ অন্য দিকে, খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক। তিনিই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম সভাপতি।

কিন্তু তার আগে ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেও একটু চোখ রাখা যাক। ১৯২০-র ২৯ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের নাগরপুরের জমিদার সুরেশ চৌধুরীর কলকাতার জোড়াবাগানের বাড়িতে নতুন ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেদিনের সভায় ছিলেন তিন বিখ্যাত খেলোয়াড় শৈলেশ বসু, নসা সেন ও অরবিন্দ বসু। ক্লাবের নাম কী হবে? শৈলেশ বসু মত দিয়েছিলেন, নাম রাখা হোক ‘ইস্টবেঙ্গল’। কিন্তু এমন নাম কি প্রদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেবে? প্রথমে গররাজি হলেও পরে মত দেন সুরেশ চৌধুরী।

জোড়াবাগানে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি

কেন মত দিয়েছিলেন? আসলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি পারিবারিক ক্লাব ছিল। এখন যেখানে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, সেখানেই ওঁর বাড়ি আর ক্লাব। যে ক্লাবে বন্ধুরা মিলে তাস, দাবা খেলতেন। শখ করে চিত্তরঞ্জন নাম রেখেছিলেন ‘ইস্টবেঙ্গল’। কোনও কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। শৈলেশ বসুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের পূর্ব পরিচয় ছিল। দু’জনেরই আদি বাড়ি ঢাকায়। তাই ক্লাবের নাম আলোচনায় উঠতেই চিত্তরঞ্জন দাশের রাখা নামটির কথা তোলেন শৈলেশ বসু। সেই ঘটনা জেনে আর না করেননি সুরেশ চৌধুরী। ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরণের পিছনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও অবদান রয়েছে। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দেশবন্ধু ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু, ক্লাব প্রতিষ্ঠা হলেও ব্রিটিশ রোষ থেকে ছাড় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। চলার পথে পদে পদে কাঁটার বেড়া। প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, এমনকী ১৯৩০ সালে দ্বিতীয় ডিভিশনে সব ম্যাচ জেতার পরেও অসহযোগ আন্দোলনের দোহাই দিয়ে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করা— প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তখন ইস্টবেঙ্গলের সামনে। প্রতিবাদে ক্লাবের কর্তা, সদস্য, সমর্থকরা মশাল নিয়ে অভিনব মিছিল করে ঘেরাও করেছিলেন ধর্মতলার আইএফএ অফিস। সেদিন অপরাহ্নের অস্তমিত সূর্যে প্রায়ান্ধকার ময়দানে জ্বলে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী মশাল। তার রং লাল আর সোনালি। তার শিখা যেন আন্দোলনের প্রতীক। ইস্টবেঙ্গলের প্রতীক হয়ে গেল সেই মশালই। ক্লাব প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার জন্ম।

এই ঘটনার ৬ বছর আগে ১৯২৪ সালে কলকাতায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেয় ইস্টবেঙ্গল। ওই বছরের ২৫ মে প্রয়াত হন বাংলার বাঘ। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তৎকালীন সভাপতি, সন্তোষের মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী প্রথম মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন। এসপ্লানেড এলাকায় জমিও সংগ্রহ করে ফেলেন। মূর্তি তৈরির টাকা তুলতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে ডালহৌসি মাঠে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হয়। সংগ্রহ করা হয় ২ হাজার টাকা। এসপ্ল্যানেডে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আজও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সেই মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

১৯৪২-এ মহাত্মা গান্ধীর ডাকে শুরু হলো ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন। কলকাতার রাস্তাঘাটে আন্দোলনকারীদের উপর শুরু হলো ব্রিটিশ পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচার। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে ময়দানকেই বেছে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এমন স্পর্ধা তো লড়াকুদেরই মানায়।

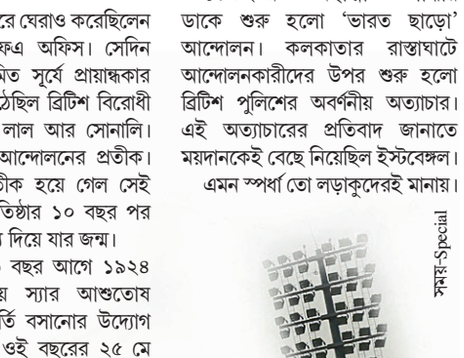

সময়-Special